ভারতের অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর ব্যাহত রূপান্তর

কালাইয়ারাসান এ.

৬ জুন, ২০২২

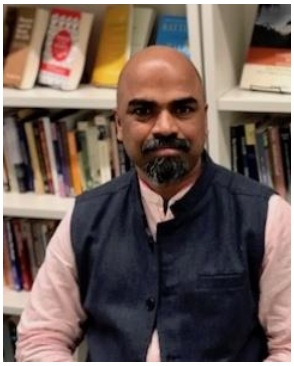

ছয় মাসের বেশি হয়ে গেছে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা (এসকেএম), অর্থাৎ প্রতিবাদী ভারতীয় কৃষকদের প্রতিনিধিত্বকারী সংগঠনগুলির প্রধান পৃষ্ঠপোষক সংস্থাটি, দিল্লির সীমান্তে তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে তাঁদের পনের মাস ব্যাপী আন্দোলনের সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন। তাঁদের কয়েকটি দাবী মেনে নেওয়া হলেও ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস (এমএসপি) ধার্য করার অঙ্গীকার তাঁরা এখনও পান নি। ভারতের কৃষিকাজের ক্ষেত্রে যে দীর্ঘস্থায়ী আর্থিক সমস্যা দেখা যায় তা সম্বোধন করার জন্য এই জাতীয় বিকাশ যথেষ্ট নয়। উৎপাদনশীলতা বাড়ান, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি, বাজারের পরিকাঠামো তৈরি, এবং ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকা মাটির গুণমানকে সম্বোধন করার জন্য কৃষি সেক্টরের সংস্কার প্রয়োজন। ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা এই বিষয়গুলি নিয়ে বিবেচনা না করলে গ্রামীণ ভারতের এই জ্বলন্ত আর্থসামাজিক বৈপরীত্য তীব্রতর হয়ে উঠবে, যেমন হয়েছিল কয়েক বছর আগে যখন জোতদার শ্রেণীর ধনী কৃষকরা সংরক্ষণের দাবীতে পথে নেমেছিলেন।

গত কয়েক দশকে গ্রামীণ ভারতের অনেক বদল ঘটেছে যার ফলে চাষবাস এমন সব নতুন সমস্যা দেখা দিয়েছে যা শুধুমাত্র চাষবাসের সঙ্গে নয়, বরং অন্যান্য নানা অর্থকারী কার্যকলাপের সঙ্গে জড়িত। এমনকি, এমএসপি চালু করার বিষয়ে একটি প্রতিশ্রুতি পাওয়াও হয়ত ভবিষ্যতের জন্য যথেষ্ট নয়। দামের দিক থেকে রাষ্ট্রের সাহায্য পেলেও তার উপকারিতা সুদূরপ্রসারী নয়। মূল সমস্যাটি আসলে কৃষি-নির্ভর অর্থনীতি ও কৃষি ব্যাতীত অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রিক অর্থনীতির উৎপাদনশীলতার মধ্যে সুবৃহৎ ও দ্রুত বাড়তে থাকা বৈষম্য। ভারতের অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে জড়িত অর্থনীতির তুলনায় শুধু নয়, অন্যান্য দেশের সঙ্গে তুলনা করলেও দেখা যাবে যে ভারতীয় কৃষি একটি অত্যন্ত অলাভজনক সংস্থা। উৎপাদনশীলতা বাড়ানর জন্য শুধু নয়, তার পাশাপাশি ভারতীয় অর্থনীতির পরিকাঠামোগত পরিবর্তনকে দ্রুততর করতে শ্রমশক্তিকে বহুমুখী করার কর্মপন্থা ঠিক না করলে কৃষকদের অবস্থা চিরকালই শোচনীয় থেকে যাবে।

বর্তমানে কৃষিকাজের অবস্থা কঠিনতর হয়ে উঠেছে

এনসিও-র সাম্প্রতিকতম তথ্য থেকে জানা যায় যে ২০১৮-১৯-এর মধ্যে ভারতের একটি কৃষি-নির্ভর পরিবারের মাসিক আয় ছিল গড়ে ১০,২১৮ টাকা। এই সংখ্যাটি গ্রামীণ ভারতের নিয়ন্ত্রিত আয়তনের পরিবারগুলির জন্য নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির থেকে অনেকটাই কম। গ্রামের পরিবারগুলির মধ্যে চুয়ান্ন শতাংশ কৃষি-নির্ভর বলে ঘোষিত যাদের মধ্যে চল্লিশ শতাংশের আয়ের উৎস হল মজুরি – ২০১৩ সালের পর থেকে আট পার্সেন্ট পয়েন্ট বেড়ে এই চল্লিশ শতাংশ হারে এসে পৌঁছেছে। যদি আমরা অব্যক্ত ব্যয় বা ইমপ্লিসিট কস্টকে এর সঙ্গে ধরি, তাহলে কৃষি-নির্ভর পরিবারগুলির গড় আয়ের উনপঞ্চাশ শতাংশই মজুরি থেকে আসে। শুধুমাত্র কৃষিকাজ থেকে আসা রোজগারের শেয়ার ২০১৩ সালে ছিল আটচল্লিশ শতাংশ এবং ২০১৯ সালে তা কমে হয়েছে আটত্রিশ শতাংশ। অন্যভাবে বলতে গেলে, কৃষির সঙ্গে জড়িত পরিবারগুলি উৎপাদিত শস্যের চেয়ে অনেক বেশি নির্ভর করে মজুরি থেকে হওয়া আয়ের উপর। আরো খারাপ বিষয় হল, অল ইন্ডিয়া ডেট অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট সার্ভের তথ্য থেকে জানা যায় যে গ্রামীণ ভারতের পরিবারগুলির মধ্যে পঁয়ত্রিশ শতাংশ ঋণগ্রস্ত। এঁদের মধ্যে চুয়াল্লিশ শতাংশ অবার অপ্রাতিষ্ঠানিক (অসংগঠিত) সূত্র থেকে ঋণ নিয়েছেন এবং এগুলির সুদের হার অত্যন্ত বেশি, অনেক সময়ই যা পঁচিশ শতাংশ

পর্যন্ত উঠে যায়। গ্রাম ও শহরের মধ্যে দ্রুত বেড়ে চলা অসাম্যের পিছনে এই গ্রামীণ প্রতিষ্ঠানগুলির সুগভীর অভাব এবং কৃষিশিল্পের স্থবিরতার যথেষ্ট অবদান আছে। ফ্যাক্টর প্রোডাকটিভিটি বা ইনপুটের থেকে আউটপুটের পরিমাণ এবং/অথবা শ্রমের উৎপাদনশীলতা বাড়িয়ে কৃষি সেক্টরের পক্ষে সম্ভব অন্য দুটি সেক্টরের (শিল্প ও পরিষেবা) সমান মর্যাদা বজায় রাখা।

বিশেষ করে ১৯৯০-এর দশকের শেষভাগ থেকে কৃষি ও কৃষি ব্যতীত অন্যান্য শিল্পের আয়ের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য এবং কৃষিক্ষেত্রের "উদ্বৃত্ত" শ্রমিকদের অন্যান্য শিল্পে আত্মীকৃত করার অক্ষমতা এই বৈষম্যকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। কৃষিশিল্পের বাইরে, ১৯৯০-এর দশক পরবর্তী যে উন্নয়নের স্রোত শুরু হয় তা ছিল মূলত পরিষেবা ভিত্তিক। বর্তমানে কৃষি ও শিল্পের মধ্যে যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। যদি এই জাতীয় বৈষম্য বেড়ে চলার পিছনে থাকে চাষ থেকে উৎপন্ন লাভের হার ও উৎপাদনশীলতা কমে যাওয়া, তবে কৃষির আকর্ষণ কমে যাওয়ার পিছনে আছে অন্যান্য পরিষেবাকেন্দ্রিক শিল্পগুলির দেওয়া নানা সুযোগসুবিধা।

নাগরিক পরিসরে থাকার সুযোগ আসলে একটি বিশেষ অধিকার

১৯৯০-এর দশক থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়ন স্পষ্টতই নাগরিক পরিসরের প্রতি পক্ষপাতদুষ্ট। নগর ও গ্রামের ব্যয়ের অনুপাত অনুযায়ী, গ্রাম-শহরের মধ্যের অসমতা, ১৯৯৩-৯৪ সালের ১.৬৩ থেকে বেড়ে ২০১৭-১৮ সালে হয়েছে ২.৪২। ভারতের কৃষিশিল্পের পতনের পাশাপাশি একটি নাগরিক পরিষেবাভিত্তিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবণতা উঠে আসছে বলে গ্রাম ও শহরের মধ্যেকার বিভাজন ক্রমশ আরও বিস্তৃত হচ্ছে। যেমন, ১৯৯৩-৯৪ সালের নগর ও গ্রামের ব্যয়ের অনুপাত ছিল ১.৬৩ যা ২০০৪-০৫ সাল নাগাদ বেড়ে হয়েছে ১.৯২। এই বিভাজন অবশেষে ২০১১-১২ সালে ১.৮৪-এ এসে স্থিতিশীল হয়। যদিও ২০১১ ও ২০১২ সালের তথ্য আলাদাভাবে আমাদের কাছে নেই, তবে এই সময়ের মধ্যেই এই প্রবণতার বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা কম, কারণ ২০১২ সালেই নাগরিকদের উপর নোটবন্দী, এমজিএনআরইজিএ-কে কোণঠাসা করে দেওয়া, বাস্তব মজুরির অবনতি এবং আন্তর্জাতিক কৃষিমূল্যে ধ্বসের মত নীতির ধাক্কা এসেছে। বরং, সম্প্রতি এনএসএসও-র পঁচাত্তরতম দফার যে তথ্য ফাঁস হয়েছে তা এই অনুপাতকে ২.৪২ বলে ধার্য করেছে। এর অর্থ হল, বর্তমানে একজন সাধারণ শহরবাসীর ব্যয়ের পরিমাণ একজন সাধারণ গ্রামবাসীর ব্যয়ের থেকে প্রায় ২.৫ গুণ বেশি।

বেসরকারী সংস্থা বনাম সরকারী নীতি

বিংশ শতাব্দীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি সেক্টর যে পন্থা গ্রহণ করেছিল, তা অনুসরণ করে ভারতীয় নীতিনির্ধারকরা ভারতীয় কৃষি সেক্টরে শিল্পায়ন (অর্থাৎ কর্পোরেটাইজ বা একটি সরকারী প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা) আনার চেষ্টা করছেন। কিন্তু, আকারে বড় কৃষিখামার, বৃহৎ খামারগুলিতে উৎপাদনের একত্রীভবন, ইনপুট ও পরিষেবার আরও বেশি করে বাজার দখল এবং কৃষিকেন্দ্রিক বাজারের সঙ্গে ও কৃষি-বিযুক্ত সেক্টরের উল্লম্ব সম্মিলনের মত যে শর্তগুলির কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রক্রিয়া সম্ভব হয়েছে, ভারতে তার কোনও অস্তিত্বই নেই। তার উপর, ভারতের রাজস্বের যা অবস্থা তাতে কৃষিক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমান হারে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেওয়া এই দেশের পক্ষে সম্ভব তো নয়ই, পাশাপাশি ইউএস যেমন করেছে সেরকমভাবে কৃষিশিল্পের শ্রমিককে উৎপাদনের কাজে স্থানান্তরিত করতেও অপারগ ভারত। এছাড়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শ্রমিকের ঘাটতি পূরণ করার জন্য যেভাবে যান্ত্রিকীকরণ হয়, ভারতে তার সংস্থান বা দক্ষতা কোনটাই নেই। কার্যত, উদ্বৃত্ত শ্রমিক ভারতের কৃষি সেক্টরের একটি প্রধানতম সমস্যা। সংক্ষেপে বলতে গেলে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে পন্থা নিয়েছে তাকে অবিকল নকল করে ভারতের কৃষিশিল্পের কোনও উপকারই হবে না।

তুলনা করতে হলে বরং গ্লোবাল সাউথ বা যে দেশগুলির অর্থনীতি "পরিবর্তনশীল" সেখানকার কৃষকদের অভিজ্ঞতার দিকে তাকান যেতে পারে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে অসংখ্য ছোট খামার দেখা যায় এবং প্রচুর শ্রমিকও সহজলভ্য। এর ফলে কৃষি ও কৃষি-বিযুক্ত শিল্পের উৎপাদনশীলতার মধ্যে যে পার্থক্য তা বজায় থাকে এবং তার ফলে গ্রামীণ ও নাগরিক পরিসরের মধ্যে অসাম্য বেড়ে চলে। সে তুলনায় চীন, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে সামাজিক ব্যয়ের হার বাড়ানর পাশাপাশি নানা অবকাঠামো-সংক্রান্ত উপাদানে বিনিয়োগ করে কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদনশীলতাই খালি বাড়িয়ে তোলেনি, সঙ্গে সঙ্গে এই দেশের কৃষকদের চাষের কাজ বাদে অন্যান্য শিল্পে যোগদানে সক্ষম করেছে। এই ভাবে চীন শুধুমাত্র কৃষির উপর নির্ভরশীল শ্রমিকের সংখ্যা কমাতে সফল হয়েছে।

ভারতে খামারের আকার ক্রমশ কমে গেলেও, এ দেশে জোত-জমা বা হোল্ডিং-এর গড়পড়তা আয়তন ১.২ হেক্টাএকর (৩ একর)। সে তুলনায় চীনের জোত-জমার আয়তন ০.৬ হেক্টাএকর (১.৫ একর) হলেও ভারতের কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদনশীলতা চীনের থেকে অনেক কম। ভারত ও চীনের ১৯৬১ ও ২০১৯ সালের গুরুত্বপূর্ণ খাদ্যশস্যের ফলন তুলনা করলে দেখা যাবে যে, চীনের উৎপাদনশীলতা ধারাবাহিকভাবে বেড়ে ভারতের থেকে অনেক এগিয়ে গেছে। ভারতে যে ধানের ফলন ৪০,৫৭৭ (এইচজি/এইচএ) তা চীনে ৭০,৬০১ এবং গমের ফলন ভারতে ৩৫,৩৩৪ (এইচজি/এইচএ) যেখানে চীনে তা ৫৬,২৯৮। দুই দেশের উৎপাদনশীলতার মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তা কৃষির উপযুক্ত জলবায়ুর পরিস্থিতি বা অ্যাগ্রোক্লাইম্যাকটিক কন্ডিশনের ফলাফল নয়, কারণ দুই দেশের জলবায়ুর ধরনই সমান। চীনের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা আদতে কৃষিক্ষেত্রে নানা প্রক্রিয়া ও প্রযুক্তি ব্যবহার এবং বিভিন্ন নীতি প্রয়োগের ফলাফল। যেমন ধরা যাক, চীনের ওয়াটার এফিশিয়েন্সি (জলের যে শতকরা হার ফসলের জন্য প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত হয়) যেখানে তিপান্ন শতাংশ সেখানে ভারতে এর হার পঁয়ত্রিশ শতাংশ। এগ্রিকালচার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইন্ডিকেটারস (এএসটিআই) অনুযায়ী, কৃষি বিষয়ক গবেষণায় ভারতের নির্ধারিত ব্যয় হল ফার্ম জিডিপির ০.৩০ শতাংশ – চীনের ব্যয়ের (০.৬১ শতাংশ) অর্ধেক। কৃষিশিল্পের উৎপাদনশীলতা বাড়ান এবং শ্রমশক্তিকে বহুমুখী করা – এই দুই ক্ষেত্রেই ভারত পিছিয়ে আছে।

অর্থনিতিবিদ সি. পিটার টিমার বলেন যে, একটি সফল কৃষিকেন্দ্রিক রূপান্তর হল এমন একটি ঘটনা যার ফলে কৃষি সেক্টর ও কৃষি ব্যতীত অন্যান্য সেক্টর – দুইয়েরই উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পায় যা খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করে এবং কৃষির উদ্বৃত্ত পুঁজিকে অন্যান্য শিল্পে বিনিয়োগের সুযোগ তৈরি করে। আরও যে পরিস্থিতির কথা তিনি উল্লেখ করেন যার ফলে এই রূপান্তর সম্ভব তা হল, একটি সহবর্তী শিল্পনীতি যার সাহায্যে কৃষি ও অন্যান্য শিল্পের মধ্যে এমন একটি কাঠামোগত সংযোগ তৈরি হয় যা একটি নাগরিক পরিকাঠামো গড়ে তোলে ও সামাজিক সহায়তা, বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে বিনিয়োগ, সম্ভব করে। এর উল্টোদিকে, ভারতের জিডিপিতে কৃষিকেন্দ্রিক উৎপাদনের ক্ষেত্রে শেয়ার অনেক কমে গেছেঃ এ দেশের জিডিপি কৃষি সেক্টরে বিনিয়োগের হারে সমতা বজায় রাখতে পারে নি এবং তার পাশাপাশি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার সরকারী পরিকাঠামোতে যথেষ্ট উন্নয়নও আনতে পারে নি। এর সঙ্গে সঙ্গে, ১৯৯০-এর দশক থেকেই সেচ, গবেষণা এবং শিক্ষাখাতে সরকারী বিনিয়োগ কমতে শুরু করেছে। অধিকাংশ কৃষি-বিষয়ক গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্যোগ হয় অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে অথবা সেগুলির জন্য আবশ্যক প্রাথমিক পরিকাঠামোই নেই।

আমরা যে ভারতের গ্রামে আরেকটি ধরনের বিক্ষোভ দেখছি, তা আশ্চর্যজনক কিছু নয়। হরিয়ানা এবং পাঞ্জাবের জাট, মহারাষ্ট্রের মারাঠা, এবং গুজরাটের প্যাটেলদের মত যে জাতিগুলির উপস্থিতি কৃষিক্ষেত্রে অনেক বেশি, তাঁদের নেতৃত্বেই পর পর এই আন্দোলনগুলি ঘটে চলেছে। তাঁদের অনেক দাবীর মধ্যে একটি হল, শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক যে চাকরিগুলি এত দিন ধরে নাগরিক পরিসর অধিকার করে থাকা উঁচু জাতের মানুষদেরই কুক্ষিগত ছিল, সেগুলিতে নিজের নিজের জাতের জন্য সংরক্ষণ। এই গোষ্ঠীগুলির মতই, কৃষিকাজের সঙ্গে জড়িত আরো অনেক গোষ্ঠী আছে যাঁদের কাছে আধুনিক পরিষেবাকেন্দ্রিক

অর্থনীতিতে অংশগ্রহণ করার মত দক্ষতা অর্জনের পর্যাপ্ত সুযোগ পৌঁছয় নি। এর পাশাপাশি, চাষবাস থেকে যা ফেরত আসে তা তুলনামূলকভাবে অতি নগণ্য হওয়ায় নৈরাশ্য আরও বাড়ে। বোধ হয়, কৃষির ভবিষ্যৎ অন্ধকার এবং আধুনিক কাজের দুনিয়া ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে। গ্লোবাল সাউথের দেশগুলি থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কৃষিকেন্দ্রিক পরিবর্তন অনেক বেশি ভালভাবে হয় যদি তা মানব সম্পদ বিন্যাসের মধ্যে দিয়ে ঘটেঃ স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির পাশাপাশি কৃষিশিল্পে বর্ধিত উৎপাদনশীলতা। তাই, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে পরিষেবার উপর ন্যায়সংগত অধিকারের দাবীটিকেই ভারতের কৃষিকেন্দ্রিক সংস্কারের দাবীর পরিপূরক বলে দেখা উচিত।

কালাইয়ারাসান এ. ব্রাউন ইউনিভার্সিটির সেন্টার ফর কনটেম্পোরারি সাউথ এশিয়ার নন-রেসিডেন্ট ফেলো এবং ভারতের মাদ্রাজ ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ (এমআইডিএস)-এর অধ্যাপক।